ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-২

প্রাচীন পৃথিবী

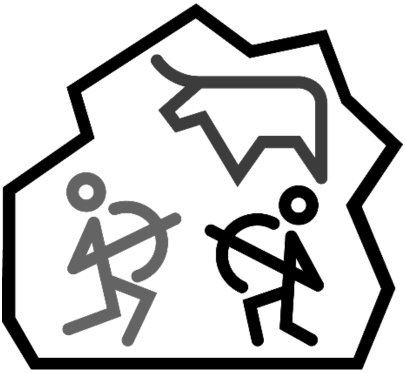

ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-২

প্রাচীন পৃথিবী

সম্পাদনা ও সংকলন
সমীর কান্তি নাথ
জয়দীপ দে

ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-২
প্রাচীন পৃথিবী
সম্পাদনা ও সংকলন : সমীর কান্তি নাথ ও জয়দীপ দে

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক ও সম্পাদকদ্বয়

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

Prachin Prithibi edited by Samir Kanti Nath & Joydip Dey Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 Second Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95631-4-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা হয় না,
তারা হয় বাংলা জানেন না,
নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
সৃষ্টির রহস্য ১৩
পৃথিবীর রহস্য ২০
গণ্ডোয়ানা মহাদেশ ২৭
পূর্বপুরুষের খোঁজে ৩৩
জীবাশ্মের চিহ্ন ধরে ৪২
অতীতের সন্ধানে ৫১
অতীতের জীবনধারা ৬১
প্রাচীন গ্রিক চিকিসাবিজ্ঞান ৬৭
বাঙালির জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় ৭৭

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অগ্রদূত ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি বলতেন, *যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা হয় না, তারা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।*

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই পরিষদের পক্ষ থেকে সে বছরই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম সম্পাদক হিসেবে প্রকাশিত হলেও এর নেপথ্যে ছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কলকাতার আপার সার্কুলার রোডের বসুবিজ্ঞান মন্দির থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি তখন দুই বাংলায় দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এখনও পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। এ পত্রিকায় বিজ্ঞানের আধুনিকতম বিষয়বস্তুগুলো রুচিশীল ভাষা ও সাবলীল বর্ণনায় উপস্থাপন করা হতো। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালি কিশোর-তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা বিনির্মাণে এই পত্রিকার ভূমিকা অনন্য। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর পুরনো সংখ্যাগুলো ঘেঁটে ধ্রুপদি কিছু বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ একত্রিত করা হয়। সেসব প্রবন্ধ সিরিজ আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

এবারের প্রবন্ধমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রাচীন পৃথিবী সম্পর্কিত ৯টি প্রবন্ধ। এর আগে বলে নেয়া দরকার কেন এমন একটি কাজে হাত দেয়া। বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। মোবাইলফোন বলতে গেলে সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি এখন নতুন প্রজন্মের কাছে শিশুকাল থেকে সহজলভ্য। এর বাইরে আছে নানা ধরনের ভিডিও গেম।

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে তোলার জন্য মৌলিক বিজ্ঞানবিষয়ক পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে সহজবোধ্য মৌলিক বিজ্ঞানের বইয়ের অপ্রতুলতা রয়েছে। আবার যে বইগুলো সচরাচর পাওয়া যায় তার বর্ণনা ও উপস্থাপনা উপভোগ্য নয়। এ কারণে বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোররা সেসব বই পড়ায় আগ্রহী হয় না। কিন্তু শিশু-কিশোরদের মনের মাঝে প্রকৃতির নানা বিষয়ের প্রতি জানার সহজাত আগ্রহ রয়েছে। এ সহজাত আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে সহজেই বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন করা যায়।

এ পর্বে প্রাচীন পৃথিবী সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শিশু-কিশোররা পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য ধাপে ধাপে জানতে পারে। শেষ এসে নিজের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাবে। মূলত শিশু-কিশোরদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে প্রবন্ধগুলো সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবন্ধের শিরোনামে সামান্য পরিমার্জন আনা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুতে সাম্প্রতিক সময়ে যে পরিবর্তন এসেছে তা সংযুক্ত হয়েছে।

প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে 'সৃষ্টির রহস্য'। এ পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হলো আমরা কীভাবে পৃথিবীতে এলাম ইত্যাদি নানা প্রশ্ন মানুষের মনে ঘুরে ফিরে আসে। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ নিখুঁত ধারণা কেউ দিতে পারেনি। কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক ধারা অনুসরণ করে একটি ধারণা দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা চমৎকারভাবে উঠে এসেছে এ প্রবন্ধে।

প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করার পর শিশু-কিশোরদের মনের মাঝে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে এই পৃথিবী কতদিন পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে? কীভাবে এই পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা হলো? এ ধরনের প্রশ্নের বিজ্ঞানভিত্তিক জবাব পাওয়া যাবে এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর উৎপত্তি ও পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে ধারণা তৈরি হওয়ার পর

আদি পৃথিবী কেমন ছিল এমন কৌতূহল সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সে কৌতূহল মেটানোর তাগিদে তৃতীয় প্রবন্ধটি নির্বাচন করা হয়েছে। যার শিরোনাম 'গণ্ডোয়ানা মহাদেশ'। আদিতে যে পৃথিবীর পুরো স্থলভাগ একটা অখণ্ড ভূমিরূপ হিসাবে ছিল এবং পরবর্তীতে তা ভেঙে কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশের উৎপত্তি হয়েছে তার চমৎকার বিবরণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

পৃথিবীতে জীবগোষ্ঠীর আবির্ভাব বিকাশ এবং বিলুপ্তি সম্পর্কে পরবর্তী প্রবন্ধগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। এ জনপদের মানুষের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় জানতে গিয়ে পাঠক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কবিতা *'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন-শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন'* পঙ্‌ক্তির যথার্থতা অনুভব করতে পারবে।

মূলত শিশু-কিশোরদের মৌলিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই সিরিজ বা প্রবন্ধমালা প্রকাশ। শিশু-কিশোররা এতে যদি সামান্য উপকৃত হয় তাতেই এ আয়োজন সার্থক।

সৃষ্টির রহস্য

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

পৃথিবীর মানুষ বিশাল বিশ্বের এক কোনে দাঁড়িয়ে বিস্মিত নয়নে দেখতে পায় তার চারদিকে অসংখ্য নক্ষত্রখচিত মহাকাশ। বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আকাশের এই জ্যোতিষ্কগুলোর তথ্য কিছুটা আমরা জানতে পেরেছি। হাজারবার প্রশ্ন করেছি, কোথায় এই বিশ্বের আদি? কোন সুদূর অতীতে কে গড়ে তুলেছে এই জ্যোতিষ্কগুলোকে? যে বিশ্বের শেষ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি, তার আদিকথা, তার সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনও মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলায় না। তবু মানুষ আদিযুগ থেকে সৃষ্টি-রহস্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। বিষ্ণুপুরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্বের রহস্য সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

কবি-সাহিত্যিকগণ যেমন কল্পনার রঙে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সৃষ্টি-রহস্য, অন্যদিকে কল্পনাকে দূরে সরিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিজ্ঞানীরা উদঘাটন করতে চেয়েছেন বিশ্বের মূল রহস্য। বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বসৃষ্টির আদিতে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল অখণ্ড গ্যাসীয় আস্তরণ বা কসমিক গ্যাস। সেই গ্যাসের অন্তর্নিহিত কোনোরূপ অস্থিরতার ফলে কসমিক গ্যাস ক্রমশ বিভক্ত হয়ে একেকটি বিন্দু আকার ধারণ করল। সেই বায়ব বিন্দুগুলোই মহাকর্ষীয় সংকোচনের ফলে নক্ষত্রে পরিণত হয়েছে। সৃষ্টির সেই প্রাথমিক পর্যায়ে নক্ষত্রগুলো ছিল শীতল ও হালকা গ্যাস দিয়ে গড়া।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন যে, প্রায় ২ বিলিয়ন বৎসর পূর্বেই নভোবায়ুমণ্ডল না কসমিক গ্যাস থেকে বিভিন্ন নক্ষত্রের জন্ম হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—বর্তমান যুগে কি আর নতুন নক্ষত্রের সৃষ্টি হতে পারে, অথবা সেই এক সময়েই বিশ্বসৃষ্টি তার পূর্ণতা লাভ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে মহাকাশের বিশেষ ও বিভিন্ন শ্রেণির নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আমাদের নক্ষত্র জগতের কয়েকটি তারকা বাকিগুলোর চেয়ে বয়সে অনেক

ছোট। লাল দানবদের (red giant star) কথা ধরা যাক। তারা তো সবেমাত্র তাদের জীবন আরম্ভ করেছে। লালউজানী নক্ষত্র E Aurigae I এখনও তার প্রাথমিক মাধ্যাকর্ষীয় সংকোচনের পর্যায়ে অবস্থান করছে। এ থেকে নিশ্চিতই বলা যায় যে, অন্যান্য নক্ষত্রের কাছে এরা নিতান্তই শিশু। এরা অন্যান্য নক্ষত্রদের জন্মের বহু পরে জন্মলাভ করেছে। সাধারণ পর্যায়ের নীলদানব নক্ষত্রগুলোর বয়সও অপেক্ষাকৃত অল্প। তাই বর্তমানকালে নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি হবে না এ কথা বলা যায় না। বরং মহাশূন্যে গ্যাসীয়-নীহারিকা নামে যে বস্তুপুঞ্জ রয়েছে তা থেকে অনায়াসে নতুন নক্ষত্রের সৃষ্টি হতে পারে। তবে এ কথা সত্য যে, সেই আদিম যুগে প্রধান প্রধান নক্ষত্রদেহের সৃষ্টি হয়ে গেছে—আধুনা এ রকম সৃষ্টি বিরল মাত্র।

শ্বেতবামন (White dwarf) নক্ষত্রগুলোকে নিয়ে আমরা আর এক সমস্যার সম্মুখীন হই। আমরা জানি, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার তাপকেন্দ্দিন (তাপসংশ্লিষ্ট) ক্রিয়ার ফলে নক্ষত্রদের তেজ নির্গত হয়। শ্বেতবামন নক্ষত্রগুলোতে হাইড্রোজেন উপাদান ফুরিয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে আর তাপকেন্দ্রিন ক্রিয়া চলে না। বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের সূর্যও একদিন এই শ্বেতবামন অবস্থায় পৌঁছাবে। এই অবস্থায় আসতে সূর্যের অথবা এ রকম নক্ষত্রের লাগবে কয়েক বিলিয়ন বৎসর; কারণ জন্মের পর সূর্য আজ পর্যন্ত তার দেহের মধ্যে থাকা শতকরা ৩৫ ভাগ হাইড্রোজেনের ১ ভাগ মাত্র ব্যয় করেছে। তাহলে লুব্ধক (সিরিয়াস) নামের মহাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির হাইড্রোজেন উপাদান ফুরাল কী করে? যেহেতু রাসায়নিক মৌল মহাকাশে সমভাবে মিশ্রিত ও পরিব্যাপ্ত রয়েছে—তাই লুব্ধকের হাইড্রোজেন উপাদান নিশ্চয়ই কম ছিল না; আবার অন্যান্য নক্ষত্রের জন্মের অর্থাৎ ২ বিলিয়ন বৎসরের অনেক পূর্বে শ্বেতবামন নক্ষত্রগুলোর সৃষ্টি হয়েছে এও সম্ভব নয়।

অধ্যাপক গ্যামো মনে করেছেন যে, বর্তমানের শ্বেতবামন নক্ষত্রগুলো কখনো শৈশব পর্যায়ে আসেনি। অত্যন্ত ভারী উজ্জ্বল ও দ্রুত বিচরণশীল নক্ষত্রগুলো তাদের সৃষ্টির পর বর্তমানের বহুপূর্বে তাদের হাইড্রোজেন ব্যয় করে ফেলেছে। তারপর আমাদের সূর্য থেকে বহুগুণ বেশি বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অতীতের এই দ্বিখণ্ডিত অংশগুলোই আজকে শ্বেতবামনরূপে আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়।

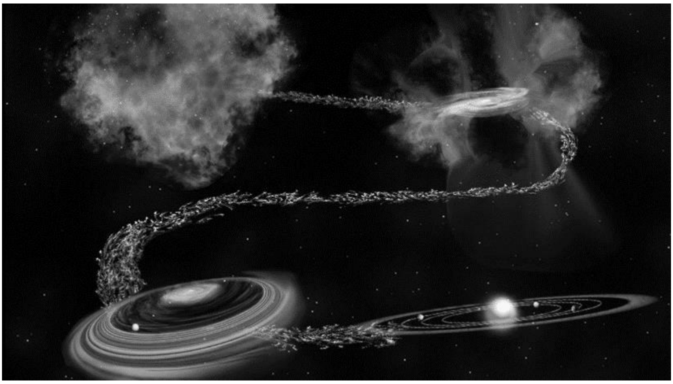

ছবি : কসমিক গ্যাস থেকে সৌরজগতের সৃষ্টি

নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য অনেকাংশে উদঘাটিত হলেও আমরা আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলোর সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট তিমিরেই আছি। বিগত শতকের জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যান্ট গ্রহ সৃষ্টির এক বৈজ্ঞানিক মতবাদ দাঁড় করেছিলেন। তাঁর মতে সূর্যের আদিম মহাবর্ষীয় সংকোচনকালে বহির্কেন্দ্রিক বল দ্বারা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন গ্যাসীয়-বলয় দিয়ে গ্রহগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই মতবাদ বেশি দিন টিকেনি। কারণ গণিতের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সংকোচন ও আবর্তনশীল সূর্য থেকে যদি গ্যাসীয়-বলয় উদ্ভূত হয়ে থাকে তবে তা একটি গ্রহে ঘনীভূত হতে পারে না। সেখানে শনির বলয়ের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ড পুঞ্জীভূত হওয়াই সম্ভব। অপরদিকে দেখা যায়, সৌরজগতের সমগ্র আবর্তনীয় ভরবেগের শতকরা ৯৮ ভাগ গ্রহগুলোর মধ্যে নিবদ্ধ রয়েছে; অথচ সূর্যের আবর্তনে এই ভরবেগ শতকরা ২ ভাগ মাত্র। মূল আবর্তনশীল বস্তুদেহে ভরবেগ এত অল্প অথচ সেই বস্তুদেহ থেকে উদ্ভূত গ্রহগুলোতে ভরবেগ এত বেশি এ কথা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। তাই বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন যে, নিশ্চয়ই সূর্য এবং অন্যান্য কোনো নক্ষত্রে ঘর্ষণের ফলে গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে আর বহিরাগত ভরবেগ সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে নিবদ্ধ রয়েছে।

এই নতুন মতবাদকে সংঘাত ও বিচ্ছিন্ন (হিট অ্যান্ড রান) মতবাদ নামে অভিহিত করা হয়। এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একদা একক সূর্য যখন মহাশূন্যে বিচরণ করছিল তখন আর একটি নক্ষত্র তার কাছাকাছি এগিয়ে আসে। গ্রহ-

সৃষ্টির জন্য উভয়ের শারীরিক প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। পরস্পরের মহাকর্ষজনিত শক্তি বহুদূরেও উভয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করল। উভয়ের দেহপৃষ্ঠে এই আকর্ষণের ফলে প্রচণ্ড ঢেউ উঠল। এই ঢেউ নক্ষত্রদেহে উচ্চতার সৃষ্টি করল। এই উচ্চতা যখনই একটা সীমা অতিক্রম করে, তখনই উভয় নক্ষত্রকেন্দ্রের মধ্যস্থলের একটি সরলরেখায় এই উচ্চ বস্তুপিণ্ড বহুধা বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিখণ্ডিত বস্তুপিণ্ডগুলোতে তাদের জনক-নক্ষত্রদ্বয়ের গতির কিয়দংশ আরোপিত হয়। তাই যখন নক্ষত্র দুটি পরস্পরকে ছেড়ে দূরে সরে যায়, তখন তারা সঙ্গে নিয়ে যায় একেকটি আবর্তনশীল গ্রহমণ্ডলী। মহাকর্ষশক্তিবলে উদ্ভূত ঢেউয়ের দ্বারা নক্ষত্রটিও গ্রহগুলোর প্রায় সমান দিকে নিজ অক্ষপথে বিচরণ করার গতি লাভ করে। যে নক্ষত্রের সঙ্গে সূর্যের সংঘর্ষের ফলে আমাদের গ্রহজগৎ সৃষ্ট হয়েছে সে নক্ষত্র আজ কয়েক লক্ষ বৎসরে হয়তো বহুদূরে সরে গিয়েছে। বিজ্ঞানীর দুরবিনে সেই চিত্র আর ধরা পড়ে না।

নক্ষত্রগুলোর মাঝখানে এতো বেশি ব্যবধান রয়েছে এবং সে তুলনায় নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ এত ছোট যে, নক্ষত্রদের মধ্যে এইরূপ সংঘাত প্রায়ই হয় না। কয়েক কোটি বছরে কয়েক কোটি নক্ষত্রের মধ্যে দু-একটি হয়তো এই সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়। আমাদের সূর্য ও তার সেই সংঘর্ষকারী নক্ষত্রই বোধহয় একমাত্র এইরূপ সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়ে গ্রহজগতের সৃষ্টি করেছে। আজও দুরবিনে নিকটতর নক্ষত্রের গ্রহ ধরা পড়েনি। তবে অনেক জুড়ি তারা আকাশে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন সৃষ্টির আদিযুগে বিভিন্ন নক্ষত্রের মধ্যে দূরত্ব ছিল অল্প। ক্রমশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্ফীত হয়ে পড়েছে—তাই নক্ষত্রদের মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে সেরূপ সংঘাত সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু সেই আদিযুগে প্রত্যেকটি নক্ষত্রের সংঘাত হওয়ার প্রচুর সুযোগ ছিল। তাই কোনো কোনো নক্ষত্রের সহায়তায় নিকটতর নক্ষত্র স্থায়ীভাবে বেঁধে রেখেছে। সেগুলোকেই আমরা জুড়ি তারা বলি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব ক্রমশ স্ফীত হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানী হাবল আমাদের দৃষ্টিপথে অনুভূত বিভিন্ন নীহারিকার বেগ পরিমাপে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, তারা ক্রমশ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বহির্ছায়াপথ নীহারিকাগুলোর এই অপসারণবেগ সব ক্ষেত্রে সমান নয়। আমাদের নক্ষত্রগুলো থেকে আমরা যতই দূরে এগিয়ে যাই, ততই এদের